গৌতম বসু

অধর্ম

'To which last question we must answer:
Beware, O Teufelsdrockh, of spiritual pride!'
— 'Sartor Resartus:' Thomas Carlyle (1795-1881)

আজ থেকে বিরাশি বছর আগে, সেই ১৯৩৬ সালে, কলকাতায় আর্যসমাজের বার্ষিক উৎসবে প্রদত্ত এক ভাষণে আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন দুটি ইংরেজি শব্দ জুড়ে একটি নতুন শব্দ তৈরি করেছিলেন: spiritual imperialism। শব্দটি তিনি নিজেই উদ্ভাবন করেছিলেন, না অন্য কোনো উৎস থেকে কুড়িয়ে পেয়েছিলেন, তা বিশেষজ্ঞরা আমাদের হয়তো বলে দিতে পারবেন, আমরা জানি না। বর্তমান পৃথিবীতে যে দশ-এগারোটি প্রধান ধর্মমত আছে তাদের মধ্যে চারটির জন্ম হয়েছিল আমাদের এই ভারতীয় উপমহাদেশে এবং অন্তত আরও তিনটির— খ্রিস্টধর্ম, ইসলাম এবং জরাথুষ্ট্র-ধর্মের প্রভাব-বিস্তার এ-দেশের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ রয়েছে। অতএব এই উপমহাদেশের চারটি আধুনিক রাষ্ট্রের কোনো সদস্যকে spiritual imperialism-এর ধর্মীয় স্বৈরতন্ত্রের প্রকৃতি ও মাত্রা সম্পর্কে নতুন করে বুঝিয়ে বলবার কোনো ক্ষেত্র হয়তো অবশিষ্ট নেই। হিন্দু কর্তৃক বৌদ্ধের নিপীড়ন ও সমুৎপাটন, উচ্চবর্ণ হিন্দু কর্তৃক নিম্নবর্ণের হিন্দুর চরম লাঞ্ছনা, মুসলমান কর্তৃক হিন্দু ও শিখ নিধন, শিয়া ও সুন্নি সম্প্রদায়ের মধ্যে রক্তস্রাবী কলহ, খ্রিস্টান কর্তৃক প্রবর্তিত 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' নীতি, স্বাধীনতা-পরবর্তী দলীয় রাজনীতিতে 'ধর্মীয়' বিষ সম্প্রচারে গর্বিত হিন্দু, ফহিন্দু-সেকুলার, মুসলমান, মৃদুবাম-নাস্তিক, সব বর্গের রাজনৈতিক দলের চূড়ান্ত দক্ষতা প্রদর্শন— এ-সমস্তই দেখল আমাদের দেশ, এবং যা অধিকতর হতাশার উদ্রেক করে, আরও অনেক দেখা এখনও বাকি। এমন যদি হত, কোনো বিশেষ কারণবশত, অন্যায় বলে আমরা চিনে নিতে পারছি না, তা হলে আত্মসংশোধনের সংকীর্ণ পথটি উন্মুক্ত থাকত। না, আমাদের দুর্ভাগ্য, পরিস্থিতি এর চেয়েও গভীর; সুস্থমীমাংসার পথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ, কারণ সঙ্কট-বিষয়ে সম্পূর্ণ অবহিত হয়েও আমরা প্রত্যেকেই কোনো-না-কোনো অনুদারতার সক্রিয় অথবা নিষ্ক্রিয় সমর্থক। আত্মনিয়ন্ত্রণ ও সহিষ্ণুতা অনুশীলনের পরিবর্তে, আমরা অন্যকে নিয়ন্ত্রণ করতে উদ্‌গ্রীব। আমি হিন্দু, ভাবছি,

পথে, ঘাটে, অতিবিপণিতে, এতগুলি সুর্মা-পরা সুখী পরিবার দেখে এলাম কেন, তবে কি সংখ্যার দৌড়ে পেরে উঠছি না আমরা— 'গর্ব সে কহো হম হিন্দু হঁয়'; আমি মুসলমান, ভাবছি, পাকিস্তান আর বাংলাদেশের মধ্যে এতটুকু তো জায়গা পড়ে আছে, এ আর এমন কী বাধা, চারের দশকের সেই প্রখ্যাত ছড়া পুনরুদ্ধার করে ক্রিকেট খেলোয়াড়দের দলকে সমর্থন জানানো থেকেই শুরু করা যাক— 'কান মেঁ বিড়ি মুঁহ মেঁ পান/লড়কে লেঁঙ্গে পাকিস্তান'; আমি নাস্তিক, ভাবছি, ধর্ম ও আফিমের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা, তিব্বতে চেয়ারম্যান মাও যে সুপ্রাচীন বৌদ্ধ সভ্যতার গলা টিপে ধরে প্রাণ বের করে দিয়েছিলেন, তা আমাকে কিছুমাত্র বিচলিত করে না। সত্য বড়ই অপ্রিয়। ভারতীয় মানুষ হয়ে ওঠার চেয়ে হিন্দু, মুসলমান, অথবা কম্যুনিস্ট হয়ে থাকা অনেক বেশি নিরাপদ ও চিত্তাকর্ষক।

প্রথম অপ্রিয় প্রসঙ্গ: পরিসংখ্যান ও ধর্মীয় আগ্রাসনের মধ্যকার সম্ভাব্য সম্পর্ক। ধর্মবিশ্বাসের দিক থেকে বিচার করলে পৃথিবীর ২০১২-র জনসংখ্যা এইভাবে গঠিত: খ্রিস্টান ৩৩%, মুসলমান ২৪.১%, অবিশ্বাসী/নথিভুক্ত নন ১৬%, হিন্দু ১৬%, বৌদ্ধ ৭% ইত্যাদি। ভারতবর্ষের ২০১১ সালের হিসেব অনেকটাই ভিন্ন: হিন্দু ৭৯.৮%, মুসলমান ১৪.২৩%, খ্রিস্টান ২.৩%, শিখ ১.৭২%, বৌদ্ধ ০.৭০ প্রভৃতি। পশ্চিমবঙ্গর ২০১১-র হিসেবটি আবার ভারতের হিসেবের প্রতিতুলনায় সামান্য অন্যরকম: হিন্দু ৭০.৫৪%, মুসলমান ২৭.০১% ও অন্যান্য ২.৪৫%। প্রথমেই যে প্রশ্ন উঠে আসছে তা এই: বিশেষ এই গঠনটি কি কেবল প্রজননের প্রাকৃতিক নিয়মের দ্বারা নির্ধারিত, না কি ধর্মীয় আগ্রাসনের কোনো নঞর্থক ভূমিকা নেপথ্যে রয়েছে? খ্রিস্টান সেনানায়ক, ধর্মযাজক ও সাধারণ ভাগ্যান্বেষীরা যখন ব্রিটেন ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে অন্য মহাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিলেন, তখন তাঁরা নিজেদের সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে-সঙ্গে খ্রিস্টধর্মকেও ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন। ইসলামের বিস্তারও সামরিক অভিযানের সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। অর্থাৎ, সমগ্র পৃথিবীকে হিসাবের অন্তর্গত করলে খ্রিস্টান ও মুসলমানের যথাক্রমে ফার্স্টবয় ও সেকেন্ডবয় হওয়ার পিছনে যে রক্তের দাগ লেগে রয়েছে, তা তথ্য হিসেবে যতই অপ্রিয় ঠেকুক, এটি একটি বাস্তব অবস্থা।

ভারতবর্ষে সনাতন হিন্দুধর্মের বৃত্তান্ত অন্যরকম হলেও, এখানেও বিস্তর মারপিট, বাড়িঘরদোর ও দেবালয়ে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছিল। জীবিত সংগঠনগুলির মধ্যে এই ধর্মমত অন্যতম প্রাচীন হওয়ার কারণে দুষণের সমস্যাও সর্বাধিক, এবং নম্বর বাড়ানো নয়, নবীন ধর্মচিন্তার প্রসারকে রুদ্ধ করে নিজের নম্বর ধরে রাখার মধ্যেই তার সংকটমোচন। বস্তুত, এমন বিচিত্র ঘটনা পৃথিবীতে অন্য কোথাও ঘটেছে বলে আমাদের জানা নেই। জৈন তীর্থংকরগণ এবং শাক্যমুনি বুদ্ধ, সকলেই ভিন্ন-ভিন্ন পন্থার অবক্ষয়ী সনাতনধর্মকে পরিশুদ্ধ করার প্রয়াস পেলেন, অথচ প্রকৃত মিত্রকে মিত্রজ্ঞানে

আলিঙ্গন করা হল না, দেওয়া হল শত্রুর শিরোপা। শাক্যমুনি বুদ্ধ এবং সারিপুত্র, মৌদগল্যায়ন, আনন্দ প্রভৃতি তাঁর শিষ্যগণ সকলেই সনাতনধর্ম থেকে যতটা সরে এসেছিলেন, কয়েক প্রজন্ম পর, বৌদ্ধধর্মের আদি সংগঠকরা প্রত্যেকেই ছিলেন বলিষ্ঠতর বিদ্রোহী; তাঁরা প্রত্যেকেই প্রায় ব্যতিক্রমহীনভাবে, উপবীত বর্জন-করা, ধর্মত্যাগী ব্রাহ্মণসন্তান ছিলেন।

	নাম/জাত	আনুমানিক কাল	স্থান	কর্মস্থল/পুথিরচনা
১	নাগসেন/ ব্রাহ্মণসন্তান	খ্রিস্টপূর্ব ১৫০	পাঞ্জাবের উত্তরপ্রান্ত, হিমালয়	শিয়ালকোট, পাকিস্তান/ রচনা: 'মিলিন্দ-প্রশ্ন'
২	নাগার্জুন/ ব্রাহ্মণসন্তান	১৭৫ খ্রিস্টাব্দ	বিদর্ভ অঞ্চল	গুটুর জেলা, অন্ধ্র প্রদেশ/ রচনা: 'মাধ্যমিক কারিকা'
৩	অসঙ্গ/ ব্রাহ্মণসন্তান	৩৫০ খ্রিস্টাব্দ	পেশাওয়ার, পাকিস্তান পাঠান	পাকিস্তান/রচনা: 'যোগাচার ভূমি'
৪	বসুবন্ধু/ ব্রাহ্মণসন্তান	৩৫০ খ্রিস্টাব্দ	পেশাওয়ার, পাকিস্তান জন্মসূত্রে পাঠান	পাকিস্তান/রচনা: 'যোগাচার ভূমি'
৫	দিঙ্‌নাগ/ ব্রাহ্মণসন্তান	৪২৫ খ্রিস্টাব্দ	কাঞ্চিপুরণ, তামিলনাড়ু পাঠান	উত্তর ভারত, পাকিস্তান/ রচনা: 'প্রমাণসমুচ্চয়'
৬	বোধিধর্ম/ অব্রাহ্মণ কাঞ্চিপুরম-এর রাজপুত্র	৪৭০-৫৩৪ খ্রিস্টাব্দ		চিনদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রথম প্রচারক/চিন-এ 'জেন' ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা (?)
৭	ধর্মকীর্তি/ ব্রাহ্মণসন্তান	৬০০ খ্রিস্টাব্দ	তিরুমালাই, তামিলনাড়ু	নালন্দা, বিহার/রচনা: 'প্রমাণবার্তিক'

আমাদের তালিকাটি দেখতে অতিসংক্ষিপ্ত হলেও সাড়ে সাত শতাব্দীব্যাপী দীর্ঘ, এবং তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ, আমরা স্পষ্ট দেখতে পারছি, বৌদ্ধধর্ম, উত্তর-পশ্চিমে, আজকের দিনের আফগানিস্তান ও পাকিস্তান থেকে শুরু করে, দক্ষিণ-পূর্বে আজকের দিনের তামিলনাড়ু পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। আজকের দিনের উত্তর প্রদেশের পূর্বাঞ্চল ও বিহার-এর উত্তরপ্রান্ত শাক্যমনি বুদ্ধর নিজের কর্মস্থল, সেই কারণে বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্মের লোকপ্রিয়তার পৃথক উল্লেখই অপ্রয়োজনীয়। সনাতনধর্মের শ্রেষ্ঠ মস্তিষ্ক ও

সংগঠকরা পুরোনো ধর্মপ্রতিষ্ঠান পরিত্যাগ করছেন একে-একে; কর্তাব্যক্তিদের পক্ষে এই পরিস্থিতি, স্বভাবতই, অনভিপ্রেত। বিপন্নতার ওই গহ্বর থেকে তাঁরা যে সনাতনধর্মকে ফিরিয়ে আনতে পেরেছিলেন এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই, কারণ লক্ষ করি, আনুমানিক ১০০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে, বৌদ্ধধর্ম, নশ্বরের যুদ্ধে স্পষ্টতই সনাতনধর্মের প্রতিতুলনায় পিছিয়ে যাচ্ছে। এই পালাবদলের সম্ভাব্য কারণগুলি নিয়ে পণ্ডিতেরা এতদিনে বিস্তর বিচার করেছেন এবং অনেক প্রস্তাব আজ বর্জিতও। দুটি প্রস্তাব টিকে গেছে: এক, সনাতনধর্মের পুনর্গঠন, যার মধ্যে 'হিন্দু ব্যাক্‌ল্যাশ্‌' নামে যে মারপিটকে আজ আমরা চিনি, তার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায়নি, এবং দুই বৌদ্ধধর্মের নিজের দূষণ। ডি. ডি. কোশাম্বী অবক্ষয়কেই প্রধান কারণ রূপে দেখেছেন। রাধাকৃষ্ণণ আরও অনেক বেশি প্রত্যয়ী, অবক্ষয়ের তত্ত্ব সমর্থনের সঙ্গে-সঙ্গে 'হিন্দু 'ব্যাক্‌ল্যাশ্‌'-এর প্রস্তাবটি তিনি সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছেন, লিখেছেন:

> 'The violent extermination of Buddhism is legendary. Buddhism and Brahmanism approached each other so much that for a time they were confused and ultimately became one. Slow absorption and silent indifference, and not priestly fanaticism and methodical destruction, are the causes of the fall Buddhism.'
>
> [Radhakrishnan Indian Philosophy Vol II Chapter X]

কিন্তু, পরিব্রাজক ফা-হিয়ান-এর ভ্রমণবৃত্তান্তে সম্পূর্ণ বিপরীত একটি ছবি উঠে আসছে। যতই মিঠে ভাষা ব্যবহার করুন তিনি, শ্রাবস্তী-র এই বিবরণে আমরা গাঁইতি-শাবলের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি:

> '... all these towers are erected in the midst of the city. The unbelieving Brahmans, entertaining a jealous feeling, desired to destroy these edifices, but on their attempting to do so the heavens thundered and the lightnings flashed, so that they were unable to carry their design into execution.'
>
> [Travels of Fa Hian and Sung-Yun Buddhist Pilgrims from China to India (AD 400 to AD 518), Chapter X translated by Samuel Beal 1869, reprinted 2016]

অবক্ষয়ী বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে ডি. ডি. কোশাম্বী-র বিষণ্ণ উক্তিও এড়িয়ে যাবার কোনো উপায় আমাদের সামনে নেই। তিনি লিখেছেন,

> 'The religion could no longer turn a Harsha from war to peace, as it had Asoka.'
>
> ['An Introduction to the Study of Indian History' by D. D. Kosambi]

একইসঙ্গে আমরা ভাবি, আজকে যেমন, ঠিক তেমন ততদিন পূর্বেও, কতিপয় কাপুরুষের হাতে হিন্দুধর্মকে বন্দি হতে হয়েছিল, যাঁরা মনে করেন, দশ-বিশটা সৌধ ভেঙে ফেলতে পারলেই বুঝি অন্য মতাদর্শকে ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়া যায়। আমরা ভাবি, সেদিন অথবা আজ, যারা এইসব কুকর্মে লিপ্ত, তাঁরা কি শূদ্র রমণীর সন্তান দ্রষ্টা মহীদাস-এর নাম শোনেননি, উচ্চবর্ণের হিন্দুরা তাঁদের ধর্মপ্রতিষ্ঠানের উচ্চাসনটি যাঁর সম্মানার্থে সর্বকালের জন্য খালি রাখতে বাধ্য হলেন, এগিয়ে চলার এই মহামন্ত্রটি যাঁর রচনা:

'নানা শ্রান্তায় শ্রীরস্তি ইতি রোহিত শুশ্রুম।
পাপো নৃবদ্ বরো জনঃ ইন্দ্র ইচ্চরতঃ সখা।।
চরৈবেতি চরৈবেতি।

[ঐতরেয় ব্রাহ্মণ: পক্ষীকা ৭ অধ্যায় ৩৩ শ্লোক ১ থেকে]

শব্দার্থ: 'অলস হলে, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিও পাপী। পথ চলতে-চলতে যিনি অবসন্ন, তিনি শ্রীযুক্ত। এগিয়ে চলেছেন যিনি, দেবতা তাঁর চিরসখা। চরৈবেতি চরৈবেতি।'

২

আমরা এতক্ষণ দেখার এবং নতুন করে বোঝার চেষ্টা করছিলাম যে, প্রত্যেক ধর্মমতেই একটা আগ্রাসনী, হিংস্র ও অশুভ অভিমুখ আছে; কোথাও তা নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রদর্শনের চেহারা নেয়, অন্য কোথাও ভীতি উৎপাদনের। প্রশ্ন রয়ে যায় মাত্র একটি: সেটিই কি তার সম্পূর্ণ রূপ? এ-প্রশ্নটি বিচার করতে গেলে আমাদের দু'টি অতিকথায় (myth) ফিরে যেতে হবে, একটি প্রাচীন, অন্যটি অর্বাচীন; প্রাচীন অতিকথাটি সমুদ্রমন্থনের এবং নবীনটি রবার্ট লুই স্টিভেনসন-এর ড. জেকেল অ্যান্ড মি. হাইড-এর। দেবতারা বহু কষ্টস্বীকার করার পর হাতে যা পেয়েছিলেন তা কেবল অমৃত নয়, আবার কেবল বিষও নয়, পেয়েছিলেন বিষামৃত এবং সন্দেহ নেই, আমাদের বাস্তব জগতের প্রতি ক্ষেত্রে এই অতিকথার সত্য প্রতিফলিত বিষ এবং অমৃতের সহাবস্থান এবং তজ্জনিত সংকট ফুটে উঠছে সর্বত্র; আমাদের নিজেদের ভিতরে এবং বলা বাহুল্য, সমাজের দেহে, ছোটো-বড়ো সমস্ত প্রতিষ্ঠানে, রাষ্ট্র পরিচালনায় এমনকী, প্রকৃতি জগতেও। পৃথিবীর প্রতিটি ধর্মপুস্তক সবচেয়ে ধারালো আঁশবটির চেয়েও ধারালো, মানুষের মনোলোকের কত স্তর, কত দেবত্ব এবং কত অসুরভাব, কত অমৃত এবং কত বিষ, কত ড. জেকেল এবং কত মি. হাইড যে সেখানে একসাথে ঘুমিয়ে রয়েছে তা আমাদের প্রথমেই জেনে নিতে হবে। 'অ্যাভেস্তা'-য় একটি বিশেষ ভাবনাসূত্রের স্পষ্ট উল্লেখ আমরা পাই, যা অন্যান্য কিছু আদিগ্রন্থেও প্রচ্ছন্নরূপে উপস্থিত। 'অ্যাভেস্তা' গ্রন্থে শুভ এবং তার বিপরীতে অশুভকে, তাদের ভিন্ন-ভিন্ন প্রকাশের মধ্য দিয়ে বোঝানো হয়েছে; শুভ-র প্রতীক অহূরা মাজ়দা (Ahura Mazda)

হলেন সৃষ্টিকর্তা (creator), এবং তাঁর প্রতিপক্ষ অশুভ-র প্রতীক অ্যাঙরা মাইনয়ু (Angra Mainyu) হলেন প্রতিসৃষ্টিকর্তা (counter-creator)। অর্থাৎ ধ্বংস-ও এক রকমের অমঙ্গলজনক সৃষ্টিই। অতীত ও বর্তমানের ঘটনাবলি লক্ষ করলে 'অ্যাভেস্তা'-র অন্তর্ভেদী দৃষ্টি আমাদের স্তম্ভিত করে।

ভালো এবং মন্দের সংকট যেহেতু চিরকালীন, সেহেতু অতীতের মানুষেরা এ-বিষয়ে কী ভেবেছিলেন তা জেনে নেওয়ার আগেই সমালোচনার অধিকার জন্মায় কি না, তা গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হওয়ার প্রয়োজন আছে। জানার তেমন প্রয়াস আমাদের মধ্যে লক্ষ করা গেছে কি? সম্যক না জেনে, না বুঝে, নিজেদের নির্বুদ্ধিতাকে সাজিয়ে-গুছিয়ে প্রজ্ঞার ভূমিকায় অভিনয় করতে পাঠিয়ে দিইনি তো? নিজেদের কুসংস্কার সম্বন্ধে আমরা পূর্ণমাত্রায় সচেতন হয়ে, তারপর কলরবে যোগদান করছি তো? বর্তমানকালে, এ-প্রসঙ্গে শুভবুদ্ধির ঘাটতিই যেন বেশি চোখে পড়ে। 'গর্ব সে কহো হম হিন্দু হঁয়'— কেবল এই স্লোগান সম্বল করে, অথবা খুব বেশি হলে 'হিন্দুধর্ম'-এর ওপর ছ-মাসের একটা ক্র্যাশ কোর্স সমাপ্ত করে, গেরুয়া হেডব্যান্ড পরে, শাবল হাতে বাবরি মসজিদের গম্বুজের মাথায় আমি চড়ে বসলাম। নিজের রূপ ঈষৎ বদলে নিয়ে, লাউডস্পিকার হাতে শতপণ্ডিতের সম্মেলনে আরও এক পণ্ডিত আমি, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিরক্ষার নামে সমস্ত ধর্মগ্রন্থ জলন্যাকড়া দিয়ে মুছে ফেলার সংকল্প ঘোষণা করলাম। এমন না হত যদি, আমি যদি সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন একজন মানুষ হতাম, আদিগ্রন্থগুলির সঙ্গে সামান্যতম পরিচয় যদি থাকত আমার, ওই দুটি কাজের কোনোটাই করে ওঠা আমার পক্ষে অসম্ভব হত। আমি শাবলের পক্ষে, না সহিষ্ণুতার পক্ষে, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বেশি সময়ের প্রয়োজন হয় না।

আমি সাধারণ ভারতীয়, সব ধর্মগ্রন্থই আমার, তাদের মধ্যে স্খলনের চিহ্নগুলি আমি উত্তমরূপে চিনি বলেই তার পুনরাবৃত্তি আমি চাই না। আমি নিজের মধ্যে মি. হাইড-কে দেখতে পাই বলেই তার বংশবৃদ্ধি আমি চাই না। আমার যে-অংশ বাবরি মসজিদের গম্বুজের মাথায় দাঁড়িয়ে আস্ফালন করছে, তাকে আমি নেমে আসার ডাক দিই। আমি তাকে দুই পঙ্‌ক্তি মিরজা আসাদুল্লা 'ঘালিব' শোনাতে চাই:

'জব্ কি তুঝ্ বিন্ কোঈ নহী মৌজুদ্
ফির ইয়ে হাঙ্গমা এ খুদা কয়া হৈ'

সংশয় জন্মাতে পারে, ঘালিব-এর এই কথাটি কতটুকুই বা প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম? এই মনীষীরা কেবল সংখ্যার দিক দিয়েই লঘু নন, এঁদের মতামতে হাজার মানুষকে যূথবদ্ধভাবে পথে নামাতে পারার সেই উন্মাদনা, সেই জৌলুসই বা কোথায়? বারবার শুভবুদ্ধির সাময়িক পরাজয় আর দুর্বুদ্ধির ক্ষণস্থায়ী বিজয়োল্লাস দেখে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। কৌতুক ও সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, শুভবুদ্ধির শক্তি ঠিক

এখানেই, তার উদ্যম প্রকট নয়, কিন্তু ক্লান্তিহীন, মানুষের আত্মসমালোচনা ও আত্মসংশোধনের প্রয়োজনবোধ সে জাগিয়ে রাখতে পারে। পৃথিবীর প্রতিষ্ঠানগুলি, তা সে ধর্মের হোক অথবা সমাজগঠনের, আত্মসংশোধনের এই নম্রতার ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে, এত ঝড়-ঝাপটার মধ্যেও শতাব্দীর পর শতাব্দী টিকে রয়েছে।

বাবরি মসজিদের টঙে অবিরাম লম্ফনরত আমি নিজেকে বলতে চাই, তুমি যে ধর্মগ্রন্থকে রক্ষা করছ বলে ভাবছ, জেনো, সে তোমার চেয়ে অনেক বড়ো, তোমার সমর্থনের কোনো প্রয়োজনই তার নেই। তুমি যে ধর্মগ্রন্থকে শাস্তি দেবে বলে অস্ত্রধারণ করলে, জেনো, সে-ও তোমার চেয়ে অনেক বড়ো, তোমার দ্বারা তার কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হবার নয়। তোমার মধ্যে যে মি. হাইড টগবগ করে ফুটছে, তার জন্মবৃত্তান্ত অতিপ্রাচীন, সমস্ত মানুষের, সমস্ত ধর্মগ্রন্থের এক প্রান্তে সে উপস্থিত, কিন্তু সুখের কথা এই যে, যেখানে-যেখানে মি. হাইড ঘুরে বেড়ায়, সেখানে-সেখানে ড. জেকেল-ও বর্তমান। আগে শনাক্ত/করো মি. হাইড-এর ধূর্ত ঘোরাঘুরি, সতর্ক করো নিজেকে, ড. জেকেল আপনিই তোমার পাশে এসে দাঁড়াবেন।

মহাভারত আদিপর্ব ২৬ জতুগৃহদাহ

এইরূপে এক বৎসর অতীত হলে পুরোচন স্থির করলেন যে পাণ্ডবদের মনে কোনো সন্দেহ নেই। যুধিষ্ঠির তার ভ্রাতাদের বললেন, এখন আমাদের পলায়নের সময় এসেছে, আমরা অন্ধকারে আগুন দিয়ে পুরোচনকে দগ্ধ করব এবং অন্য ছজনকে এখানে রেখে চলে যাব। একদিন কুন্তী ব্রাহ্মণভোজন করালেন, অনেক স্ত্রীলোকও এল, তারা যথেষ্ট পানভোজন করে রাত্রিতে চলে গেল। এক নিষাদ-স্ত্রী তার পাঁচ পুত্রকে নিয়ে খেতে এসেছিল, সে পুত্রদের সঙ্গে প্রচুর মদ্যপান করে মৃতপ্রায় হয়ে গৃহমধ্যেই নিদ্রামগ্ন হল। সকলে সুষুপ্ত হলে ভীম পুরোচনের শয়নগৃহে, জতুগৃহের ধারে এবং চতুর্দিকে আগুন লাগিয়ে দিলেন। পঞ্চপাণ্ডব ও কুন্তী সুরঙ্গে প্রবেশ করলেন। প্রবল বায়ুতে জতুগৃহের সর্বদিক জ্বলে উঠল, অগ্নির উত্তাপে ও শব্দে নগরবাসীরা জেগে উঠে বলতে লাগল পাপিষ্ঠ পুরাচন দুর্যোধনের আদেশে এই গৃহদাহ করে পাণ্ডবদের বধ করেছে।

[অনুবাদ: রাজশেখর বসু।]

পবিত্র বাইবেল পুরাতন নিয়ম গীতসংহিতা ১৩৭ ই ৫১৮ বা ৯৩৮ গীত ২৭২

১. ব্যাবিলনের নদীতীরগুলিতে আমরা বসিয়াছিলাম, এবং জ়ায়ন-এর কথা স্মরণে আসামাত্র, হায়, আমরা অশ্রুপাত করিয়াছিলাম।

২. সেইস্থানে, উইলোবৃক্ষের প্রশাখায়, আমাদের বাদ্যযন্ত্রগুলি আমরা টাঙাইয়া রাখয়াছিলাম।
৩. কারণ, উহারা আমাদিগকে সেইস্থানে বন্দি করিয়া লইয়া গিয়াছিল। যাহারা বিনষ্ট করিল আমাদিগকে, তাহারাই আনন্দধ্বনি শুনিতে চাহিল, বলিল, 'জ়ায়ন-এর একটি গীত শুনাও।'
৪. ঈশ্বরের গীত কীভাবে গাহিব, এই অদ্ভুত প্রবাসে?
৫. আমি যদি কভু ভুলি তোমায়, যেরুসালেম্, আমার দক্ষিণহস্ত যেন তার সমূহ চতুরালি বিস্তৃত হয়।
৬. যদি ভুলিয়া যাই কভু, আমার জিহ্বা যেন আমার মুখগহ্বরে রুদ্ধ হয়; আমার সুখ যদি যেরুসালেম্-এর সুখের চেয়েও অধিক হয়।
৭. যেরুসালেম্-এর (অন্তিম) কালে, ঈদম-সন্ততিগণের সেই বাক্য, চিত্তে ধারণ করিয়া রাখিবেন, হে ঈশ্বর, 'ধ্বংস করো, ধ্বংস করো, মূল অবধি।'
৮. ওগো ব্যাবিলন-দুহিতা, বিনাশের পাত্রী তুমি, কি সুখী হইবেন সেইজন, যিনি পুরস্কৃত করিলেন তোমারে, যথা তুমি আমাদিগকে সেবিলে।
৯. কি সুখী হইবেন সেইজন, যিনি তোমার শিশু সন্তানদিগকে তুলিয়া লইয়া পাষাণে আছড়াইয়া ফেলিবেন।

পবিত্র কুরান সূরাহ ২ অল-বকরহ ১৩-২০

১৩. দুষ্টপ্রকৃতির মানুষদের উদ্দেশে যখন বলা হইয়াছে, 'বিশ্বাসী হও, উহাদের (অল-মদিনা-র অধিবাসীদের) ন্যায়', প্রত্যুত্তরে তাহারা বলিয়াছে, 'নির্বোধেরা যেমন বিশ্বাস করিয়াছে, আমরা কি সেইভাবে বিশ্বাস করিব?' উহারা নিতান্ত মুর্খ, যদিচ তাহারা আপনার মূর্খতা বিষয়ে অবহিত নয়।
১৪. বিশ্বাসীদের সহিত তাহাদের যখন সাক্ষাৎ হয়, তাহারা বলিয়া থাকে, 'আমরাও বিশ্বাসী', তথাপি একান্তে, যখন তাহারা শয়তানের সঙ্গ করিতেছে, কহে 'জানিবেন, আমি আপনার অনুচর, তখন উপহাস করিতেছিলাম মাত্র।'
১৫. আল্লাহ বিদ্রুপ করেন তাহাদের, ভ্রান্ত পথপরিক্রমা দীর্ঘতর করিয়া দেন, যাহাতে তাহারা অন্ধকারে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরিতে থাকে।
১৬. তাহারা সঠিক উপদেশের পরিবর্তে ভ্রান্তি ক্রয় করিয়াছে সেহেতু তাহাদের বাণিজ্যও অসার্থক। তাহারা সদুপদেশ পাইল না।
১৭. তাহাদের দশা এইরূপ হইল; তাহারা অগ্নি প্রজ্বলিত করিল এবং ঠিক যখন চতুষ্পার্শ আলোকিত হইয়াছে, ঠিক তখনই আল্লাহ আলো ফিরাইয়া লইলেন, তাহারা অন্ধকারে পড়িয়া রহিল, দেখিতে পাইল না কিছু।

১৮. তাহারা বধির, মূক ও অন্ধ, সঠিক পথে তাহারা ফিরিয়া আসিতে পারিল না।
১৯. যেন এক ঝড়বৃষ্টির নিশাকাল; যেখানে তমসা আর অশনিসম্পাত এবং বিদ্যুৎপ্রভা। বিদ্যুতের ভীষণ ক্ষণদ্যুতির সময়ে তাহারা প্রাণভয়ে অঙ্গুলিদ্বারা কর্ণযুগল ঢাকিল। কিন্তু তাহাদের তুলনায় আল্লাহ-র বল অসীম।
২০. বিদ্যুৎপ্রভা তাহাদের দৃষ্টিশক্তি হরণ করিল প্রায়, বিদ্যুৎ যখনই ঝলসিয়া উঠে তাহারা খানিক অগ্রসর হয়, তমসা যখন আবৃত করিয়া ফেলে তাহাদের, তাহারা স্থির দাঁড়াইয়া রহে। আল্লাহ অতি সহজেই তাহাদিগকে প্রদত্ত শ্রবনশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি বিনষ্ট করিতে পারিতেন। অহো, আল্লাহ সর্বশক্তিমান।

জ্যাড়স্তা ফার্গাদ ১৬ ১-১৮

১. হে বস্তুপৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, যে দিবপুরুষ! মাজ়দা-উপাসক কোনো সংসারে, কোনো নারীর ঋতুস্রাব অথবা অন্য কোনো কারণে, রক্তক্ষরণ হলে, কী পন্থা অবলম্বন করা উচিত?
২. অহূরা মাজ়দা উত্তর করিলেন, 'যে-কোনো প্রকারের কাষ্ঠ, তৃণ হউক, বৃক্ষ হউক, অথবা নিষ্প্রাণ কাণ্ড, তাহার চলার পথ হইতে সরাইয়া ফেলিতে হইবে, ভূমিতে শুষ্ক ধূলি ছড়াইয়া দিতে হইবে, আপনার গৃহের উচ্চতা অপেক্ষা অর্ধেক, অথবা এক-তৃতীয়াংশ অথবা এক-চতুর্থাংশ অথবা এক-পঞ্চমাংশ উচ্চতর একটি চত্বর নির্মাণ করিতে হইবে, যাহাতে সেই স্ত্রীলোক অগ্নিদেবের দর্শন করিতে না পারে।'
৩. হে বস্তুপৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, হে দিব্যপুরুষ! অগ্নির উৎস হইতে কত দূরে? জলের উৎস হইতে কত দূরে? বারেস্মা-র পবিত্র গুচ্ছ হইতে কত দূরে? আপনার অনুগামীদের হইতে কত দূরে?
৪. অহূরা মাজ়দা উত্তর করিলেন, 'অগ্নির উৎস হইতে পঞ্চদশ পদক্ষেপ দূরে, জলের উৎস হইতে পঞ্চদশ পদক্ষেপ দূরে, বারেস্মা-র পবিত্র গুচ্ছ হইতে পঞ্চদশ পদক্ষেপ দূরে আমার অনুগামীদের হইতে তিন পদক্ষেপ দূরে।'
৫. হে বস্তুপৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, হে দিব্যপুরুষ! ঋতুস্রাব অথবা অন্য কোনো কারণে, যে নারীর রক্তক্ষরণ হইয়াছে, তাহার নিকট যে খাদ্য পৌঁছাইয়া দিবে, সে কত দূরে দাঁড়াইয়া রহিবে?...

[পূর্ব, (অ)ধর্ম সংখ্যা ২০১৮]